থামতে পারি সমে এসে - ওস্তাদ আলি আকবর স্মরণে

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

অন্তত দশ বছ সঙ্গীত সাধনা করলে নিজে তৃপ্তি পেতে শুরু করবে। বিশ বছর সাধনা করলে তুমি তোমার শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পারবে। সাধনা ত্রিশ বছর অতিক্রম করলে হয়ত তোমার গুরু তৃপ্ত হতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বরকে তৃপ্ত করার জন্য তোমাকে আরো আরো অপেক্ষা করতে হ'তে পারে...

কথাটা বলেছিলেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

ঈশ্বরকে তৃপ্ত ক'রে, তাঁর সরোদটি নামিয়ে রেকে চলে গেলেন সুরের এই যাদুকর, যাঁকে তাঁর সঙ্গীতগুরু, বাবা আলাউদ্দীন খাঁ সহেব 'স্বর সম্রাট' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। গুরুর বয়স তখন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে।

হয়ত এরপর শুরু হয়েছিল ওস্তাদ আলি আকবরের ঈশ্বরকে তৃপ্ত করার সাধনা। সে গূঢ় তত্ত্বের কতটুকু বা আমাদের, এই একবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক চেতনায় ধরা পড়ে। করব কেমন ক'রে। যাঁরা তাঁর সরোদ বাদন শুনেছে, এ অসহায় বোধের সামনে তাঁদের দাঁড়াতেই হবে।

শিল্পী কতরকমের যে হতে পারে, কে জানে! কারো সুর কখন ওঠে, কোথা থেকে যে মিশে যায় তার কিনারা মেলে না! সেনী ঘরাণার প্রখ্যাত সেতারী ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ'র সুরের শুরুটা খুঁজতে হত আর আলি আকবর খাঁ সাহেবের শেষটা। প্রথম আঘাত থেকে স্থিতি, স্থিতি থেকে সুরের এই লয়— সবটাই চিনিয়ে দিত—ইনি ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। এত শান্ত, সমাহিত সরোদের ধ্বনি, তাঁর আগে আর সৃষ্টি হয়নি। বিশ্বের সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বিশ্বদেবের তো বটেই!

প্রথম যখন তাঁর সরোদ শুনি, তখন হৃদয়কে যা বেশি আলোড়িত ক'রেছিল, তা তাঁর সুরের রেশ নয়, বরং তার সূচনার আকস্মিকতা। স্ট্রোকের এই বলিষ্ঠতা যখন মখমলের মত পেলব মীড় হয়ে মিলিয়ে যেত, সে বিহ্বলতা অকল্পনীয়। এই বলিষ্ঠতা আর পেলবতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ওস্তাদ আলি আকবরের সরোদ। তাঁর প্রতিটি 'টাকা'র সঙ্গেই মিশে থাকত গভীর ধ্যান, যা অর্জন করতে একসময় তাঁকে দৈনিক ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত রিয়াজ করতে হয়েছিল। তখন তিনি বালক, তাই সবটাই যে তাঁর কাছে খুব উপভোগ্য হয়নি, এটা অনায়াসেই ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বাবার শাসন বড় কড়া শাসন। একটু নড়চড় হ'লেই ব্যস্। আর দেখতে হবে না।

অতএব কঠোর অনুশাসনের, কঠোর নজরদারিতে চলত ঘন্টার পর ঘন্টা রিয়াজ, বছরের পর বছর। তখন কারো সঙ্গে কথা বলার হুকুম ছিল না। খেতে বসতে হত বাবার সঙ্গে, সময় তিন মিনিট। সময় অতিক্রান্ত হ'লে না খেয়েই উঠে পড়তে হ'ত। মা এসে কোনো কোনো দিন জানলা দিয়ে খাইয়ে যেতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। এইভাবেই বছরের পর বছর!

আত্মপ্রকাশের শুরু হয় ১৩ বছর বয়সে। প্রথম বাইরের একটি অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাল, লয়, সুর ভাব—সবেতেই তখন তিনি অসামান্য হয়ে উঠেছেন। শুধু তো সরোদ নয়, আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে তাঁর শিক্ষার শুরু কণ্ঠ সঙ্গীতে। এক কাকার কাছে সেই সঙ্গে চলেছিল তবলার তালিম। কোথাও কোনো ফাঁক ছিল না।

ইতিমধ্যে, তাঁর বয়স যখন কুড়ির ঘরের গোড়ার দিকে তখন তিনি আকাশবাণীতে প্রথম অনুষ্ঠান করেন। একে একে গ্রামোফোন রেকর্ডও বেরোতে শুরু করে। তখন গালার রেকর্ডের যুগ। কালো কালো কালার চাকতি বন বন করে ঘুরপাক খেত প্রতি মিনিটে আটাত্তর বার আর ফুরিয়ে তে তিন মিনিটেই। মাত্র তিন মিনিটের আঁচড়েই এমনি সব অজস্র চাকতির বুকেই আঁকা হয়েছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতম সব নিদর্শন— জোহরা বাই, মৌজুদ্দীন খাঁ, কালে খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, আলি আকবর খাঁ...

সেসব রেকর্ড যখনই শুনেছি, তখনই মনে হয়েছে, রাগসঙ্গীতের এমন সংহত রূপরেখা অমরা পেতামই না, যদি না ঐ আটাত্তর পাকের রেকর্ড আবিস্কৃত হত। মনে হয় প্রতিটি রাগের চরমতম রূপ ধরা আছে, ওরই মধ্যে, ঐ তিন মিনিটের পরিসরে! রাগ দেশ, জিল্‌হা কাফি, আহির ভৈরব, ভৈরবী, সিন্ধু ভৈরবী, সারং, লঙ্কাদহন সারং, যোগিয়া কালিংগ্রা, ভাটিয়ার, সোহিনী, বসন্ত মুখারি, বসন্ত, ললিত, জৌনপুরী, দরবারী কানাড়া, বাগেশ্রী, —এমনি বেশ কিছু রেকর্ড করেছিলেন আলি আকবর খাঁ সাহেব। কিন্তু, হায়! তার অধিকাংশই আজ অতি দুর্লভ! পাওয়া যায় না কোথাও! যা পাওয়া যায়, তা শুনলে তৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়। মনে হয়, এমনটি আর হয় না। পরবর্তী কালে, ষাটের দশকের সূচনায়, যখন তাঁর প্রথম লং প্লেয়িং রেকর্ডগুলি বেরোতে শুরু করল, এখন একদিকে যেমন রাগের আরো বিস্তারিত রূপ ধরা রইল, অন্য দিকে তেমনি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে শুরু করল সেই সব অবিস্মরণীয় রেকর্ড।

হায় রে ভারতবর্ষ। কী নিদারুণ অবহেলা। এভাবে কি একদিন তুমি নিজেই হারিয়ে যাবে?

তবু, অনেক হারিয়েও এখনো কিছু আছে। যা আছে, তাতেই বিস্ময় বাধ মানে না। সব না হলেও, লং প্লেয়িং রেকর্ডের অনেকগুলিই এখন কম্প্যাক্ট ডিস্কে পাওয়া যায়। যাঁরা সামনে থেকে সেই মহান শিল্পীর বাজনা শোনার অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি, এই সব রেকর্ডিং তাদের জন্যও এক অক্ষয় আনন্দের উৎস হয়ে রইল। তাঁর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ঠিক কোথায় ছিল এগুলি তার ঐতিহাসিক দলিল রূপে থেকে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। গবেষকদের কাছে এখন এগুলিই তো এখন আলি আকবর খাঁ সাহেবের প্রতিনিধি! শিল্প যে এত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা খাঁ সাহবের এই সব রেকর্ড না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। শুনতে শুনতে প্রায়ই মনে হয় অডিও নয়, যেন ভিডিও রেকডিং শুনছি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুরের এক সমুদ্র আর তার ওপারে ধ্যানস্থ শিল্পী, সরোদের তারের ওপর চলছে তাঁর আঙ্গুলের অবলীলা। মনে হয় সরোদ যেন জীবন্ত উঠেছে তাঁর হাতে।

সত্যিই তাই-ই মনে হয়েছে, যতবার তাঁর অনুষ্ঠান শুনেছি। যন্ত্রটি তাঁর হাতে এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তার ধ্বনি ছিল নতুন, তার গঠন ছিল নতুন, আর তার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল শিল্পীর ভাব ও ভাবনা— যার তুলনা তাঁর পূর্বসূরিদের কারোরই মিল ছিল না। এমনকি তাঁর বাবা সঙ্গীত গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁরও না!

কিন্তু আলি আকবর খাঁ সাহেবের বিশিষ্টতা ঠিক কোথায় ছিল, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। নিশিষ্টতা ছিল তাঁর শিল্পের সর্ব অবয়বে।

প্রথমতঃ, যদি তাঁর পূর্বসূরিদের সরোদের আওয়াজ শুনি তাহলে বোঝা যাবে ধ্বনির পার্থক্য ছিল একটি প্রধান বিষয়। তাঁর গুরু, বাবা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সরোদের আওয়াজ ছিল কিছুটা তীক্ষ্ণ এবং তাতে সুরের রেশও ততটা ধরে রাখা যেতনা। আলি আকবর খাঁর সরোদে এই রেশ থাকত অনেক বেশিক্ষণ, ফলে তাঁর বাদন শৈলীতে মীড়ের প্রাধান্য এল এবং সরোদের সুরে প্রকাশিত হল গায়কী অঙ্গের প্রভাব। মাইহার ঘরানার রীতি অনুসারে তাঁর বাজনায় যদিও খেয়ালের চাইতে ধ্রুপদাঙ্গেরই কর্তৃত্ব, তবু সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব শিল্প চেতনা ও নৈপুণ্য, যা তাঁকে ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল, ঠুংরি এমনকি লোকগীতিরও খুব কাছাকাছি নিয়ে গেছে বারবার। তব বলদ, শুধুমাত্র একটি শিল্পীসত্তা বা সৃজনশীলতা একজন আলি আকবর খাঁকে সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু এক প্রজন্মের সংস্কার বা সাধনারও নয়। নিরলস রিয়াজ বা তালিমও নয়। যত্নশীল যে কোনো গুরুও পারেন না। তার সঙ্গে চাই বহু প্রজন্মের প্রজ্ঞা ও প্রযত্ন লালিত সংস্কার— যাতে চলতি কথায় ঘরানা বলা হয়। গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয় এই ধারা। কিন্তু যে কোনো গভীর এবং গূঢ় সাধনলব্ধ ঐশ্বর্যের মত, আধুনিকতা আর যুক্তিনিষ্ঠার প্রতি অতিউৎসাহে সে ধারার গতিও আমরা প্রায় স্তব্ধই করে ফেলেছি। এখনকার মানুষ ঘরানাকে স্বীকারই করে না। অনেকের মতে ঘরানা মানে আসলে সঙ্গীতকে নিজের পরিবারে কুক্ষিগত

করে রাখার একটা চাল মাত্র। আবার কেউ বলেন, ওটা নেহাৎই সেকেলে একটা কুসংস্কার। একজনের বক্তব্য ঘরানা বলে কিছুই নেই, পার্থক্য যা, তা শুধু মাত্র গানেশ বন্দিশে।

কেউ যদি কেশর বাঈ আর মাগুবাঈ-এর গানের মধ্যে শুধুমাত্র বন্দিশ ছাড়া আর কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে না পান, তবে সেটা তাঁকে দেখাবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। এনায়েৎ খাঁ আর ওয়াহিদ খাঁর সেতারেও কি সেই অন্তর্লীন সূত্রটি অনুভব করা যায়না? কিংবা ফৈয়াজ খাঁ, বিলায়েৎ হুসেন খাঁ, খাদিন হুসেন খাঁর গানে? অনুভব কি সত্যিই করা যায় না? যার এবং একটু তীক্ষ্ণ বোধ সম্পন্ন যে কোনো শ্রোতাই সেটা আবিষ্কার করতে পারেন অনায়াসে।

আসলে, প্রতিটি ঘরানার বিশিষ্টতা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমগ্র অবয়বে যে বৈচিত্র রচনা করেছিল, সাম্প্রতিক ঘরাণা বিরোধিতার হুজুগে সে বৈচিত্র্য অতি দ্রুত তিরোধানের পথে। যাঁরা একাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের এ উৎসাহের পশ্চাদ্‌পটে আধুনিকতা বা বিজ্ঞানমনস্কতার বাতিক যে অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল, তাতে যান্ত্রিকতা আসে কিন্তু 'ভাব' সঞ্চার হয় না— যা শিল্পের প্রায় স্বরূপ। নিয়মের বাইরে যা, সেই 'ভাব'ই একটি ঘরানা থেকে অন্য ঘরানাকে পৃথক করে। ঘরানা কোনো ভঙ্গিমা মাত্র নয়, যা শিল্পকে বেঁধে রাখে বা তার মুক্তিকে খর্ব করে, বরং, তা শিল্পকে ভাবগত একটা নতুন মাত্রা দেয় এবং নতুন বলেই, তা শিল্পীর বিচরণ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। যিনি প্রকৃত শিল্পী তিনি ঘরানার যুগ - সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করেও স্বকীয়তাকে প্রকাশ করেন। প্রত্যেক শিল্পীর শিল্পই ঘরানাকেও প্রসারিত করে নতুন দিগন্তে।

কিন্তু প্রশ্ন— ঘরানার সৃষ্টি হয় কিভাবে?

বিভিন্ন ঘরানার নামগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায়, ঘরানাগুলি সৃষ্টি হয়েছিল মূলত দুভাবে। বেশির ভাগ ঘরানার নামের সঙ্গে কোনো একটি জায়গায় নাম যুক্ত থাকে। যেমন, আগ্রা ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, পাতিয়ালা ঘরানা, রামপুর ঘরানা...এবং এইসব মূলত কণ্ঠ সঙ্গীতের ঘরানা হিসেবেই পরিচিত। বীণ ঘরানার মধ্যে জয়পুর ঘরানা, সাহারাণ পুর ঘরানা, সেতার ঘরানার মধ্যে গোয়ালিয়র ঘরানা, ইন্দোর ঘরানা, বেনারস ঘরানা, সাতারা ঘরানা, ঢাকা ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, দ্বারভাঙ্গা ঘরানা এবং সরোদ ঘরানার মধ্যে রামপুর ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা প্রভৃতি। এক্ষেত্রেও প্রতিটি নাম উঠে এসেছে বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে। কিন্তু এছাড়াও আছে সেনী ঘরানা, যা মিঞা তানসেনের নামে চিহ্নিত, ইমদাদ খানী ঘরানা, যা সেতার, ও সুর বাহারের কিংবদন্তী শিল্পী ইমদাদ খাঁ-র নামে —এসরই ব্যক্তি বা শিল্পীর নামে নামাঙ্কিত। তবে আলাউদ্দীন খাঁ প্রবর্তিত ঘরানা, মাইহার ঘরানা একটি স্থানে নামেই পরিচিত। মাইহার মধ্য প্রদেশের স্থান, যেখানে রাজ দরবারে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব সভা - শিল্পী হিসাবে যোগদান করেন এবং বসবাসও করেন। সেটা তাঁর জীবনের শেষ পর্বের কথা। সুতরাং, ঘরানা হিসেবে মাইহার এখানে নোহাৎই অর্বাচীন। বলা হয়, কোনো অঞ্চলের অথবা কোনো মহান শিল্পীর সৃষ্টি করা সঙ্গীত ধারা পরবর্তী কালে গুরুশিষ্য পরম্পরায় অন্তত তিনটি প্রজন্ম অতিক্রম না করলে তাকে ঘরানা বলা যায়না। কিন্তু, ঘরানা বলি বা না বলি, আলিউদ্দীন খাঁ সাহেব, যে শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নতুন শৈলীর সূচনা করে ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। যে ঐতিহ্য থেকে এ শৈলীর উদ্‌গম, শিকড়ের সূত্র ধরে তাকে যুক্ত করা যায় মিঞা তানসেনের ভাবধারার সঙ্গে। আলাউদ্দীন খাঁ অনেকের কাছেই তাঁর সঙ্গীতের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন, অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত), আহমেদ আলি খাঁ, গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী, রামধন শীল, শ্যামচাঁদ দাস প্রমুখ। যেখানেই ঐশ্বর্য পেয়েছেন, সংগ্রহ করেছেন নিবিষ্ট যত্নে ও সাধনায়। কিন্তু তাঁর গুরুদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন, রামপুর বীণকর ঘরানার ওস্তাদ উজির খাঁ। তানসেন বংশীয় দশম প্রজন্মে এসেছিলেন উজির খাঁর। মিঞা তানসেন ⇨ বিলাস খাঁ ⇨ উদয়সেন ⇨ করিম্মসন ⇨ রাজররস খাঁ ⇨ মসীদ খাঁ⇨ মহম্মদ খাঁ ⇨ দুলহা খাঁ ⇨ হায়দর বক্স ⇨ উজির খাঁ। এরই শিষ্য আলি আকরবর খাঁ। ঐতিহ্য ও প্রজ্ঞার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারা এসে মিশেছিল বাংলার লোকগীতি ও কীর্তনের রসে, যা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গীতকে বিশিষ্ট, পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তারই নাম মঅইহার ঘরানা। কালের বিচারেও একে এখন তার ঘরনা বলতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়; কারণ তিনটি প্রজন্ম অতিক্রম করেও এই সঙ্গীত শৈলী এখনো জীবন্ত!

শুধু ভাবের বা বাদন শৈলীর বিচারেই নয়, আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব সরোদের সাবেকী গঠনেও কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন। সাবেকী সরোদে প্রধান তার ছিল সৃষ্টি। সাধারণত, এর এক নম্বর এবং দুনম্বর তার দু'টির মধ্যমে, তিন এবং চার নম্বর তার দু'টি ষড়জে এবং পাঁচ ও ছ নম্বর তার দু'টি বাঁধা হত পঞ্চমে। এ ছাড়া থাকত পাঁচটি 'পার্শ্বতন্ত্রিকা' বা ফার্সী ভাষায় 'তরফ্' এর তার, যা সরাসরি আঘাত করে বাজানো হত না, কিন্তু মূল তারের সঙ্গে অনুরণিত হত। সেতারের মত সরোদেও তরফ্ এর তার সাথে মূল তন্ত্রীর নীচে সারি বদ্ধ ভাবে। বর্তমানে তরফ এর সংখ্যা এগারো থেকে পনের পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মাইহার ঘরানার সরোদে, মূলতন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে ছ'টির জায়গায় আটটি করা হয়। এই সরোদ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এবং তাঁর ভাই ওস্তাদ আছেয়ত আলি খাঁ-র যুগ্ম অবদদান। আগেকার দিনের সরোদে ছ'টি মূল তন্ত্রীর মধ্যে পাঁচটিই ছিল পরিবর্তনীয়; অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নীচে মূল দণ্ড বা কাঠের 'পট্‌রি'র ওপর চেপে ধরে সুর ইচ্ছে মত বদল করা হত এবং ষষ্ঠ তারটি ছিল অপরিবর্তনীয়। কিন্তু মাইহার সরোদের আটটি তারের মধ্যে চারটি মাত্র ব্যবহৃত হত পরিবর্তনীয় রূপে, বাকি চারটি অপরিবর্তনীয় সুনির্দিষ্ট সুরে বাঁধা থাকত।

সুতরাং, এগারোটি তরফের তার ধরলে মাইহার ঘরানার সরোদে তাদের সংখ্যা উনিশটি। অবশ্য অন্যান্য ঘরানার শিল্পীরা অধিকাংশই এখনও পর্যন্ত প্রচলিত সরোদই ব্যবহার করেন। আগে সরোদের তন্ত্রীগুলিতে জীবজন্তুর নাড়ি বা তাঁত ব্যবহার করা হত; কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে, যখন তাঁদের পরিবর্তে লোহার তার ব্যবহার হতে শুরু করল, তখন কাঠের দণ্ডের ওপর লোহার পট্‌রি জুড়ে দেওয়া হল। মাইহার সরোদে-ও এসবই ছিল এবং ওস্তাদ আলি আকবরের যাত্রা শুরু এই উন্নত সরোদকে সঙ্গী করেই।

সরোদের ক্ষেত্রে ঘরানার ধারণা খুব একটা পুরোনো নয়। তবে সে সময় আরো দু'টি বাদন শৈলী উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। একটি হল ওস্তাদ আমীর খাঁ শৈলী এবং অন্যটি ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁর ধারা। এই দু'টি ধারাই আবার মিঞা তানসেনের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্রের গুরু ওস্তাদ আমীর খাঁ ছিলেন তানসেন বংশীয় ওস্তাদ কাজাম খাঁর পুত্র। এঁর সঙ্গীতের শিক্ষা গুলাম আলি সরোদ ঘরানার ওস্তাদ আবদুল্লা খাঁর কাছে এবং হাফিজ আলি খাঁ রামপুরে ওস্তাদ উজির খাঁর কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন, যিনি ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁরও গুরু। তবু দু'জন প্রতিভাবান শিল্পীর পথ এবং ধারা তো পৃথক হবেই। তাই আমীর খাঁ হাফিজ আলি খাঁ এবং আলাউদ্দীন খাঁও সম্পূর্ণ পৃথক ধারার শিল্পী। ঠিক একই কারণে আলাউদ্দীন খাঁর পুত্র এবং শিষ্য হয়েও, আলি আকবর খাঁ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্রোতের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন কালক্রমে। তাঁর মধ্যে তাঁর গুরুর অনুরণন ছিল, কিন্তু অনুকরণ ছিল না।

অন্যান্য ঘরানার সঙ্গে মাইহারের মূল পার্থক্য তার ধ্রুপদী অঙ্গে। ফলত এর প্রকৃতি অনেক গম্ভীর এবং শান্ত রসাত্মক। আলাপ থেকে জোড় অংশে প্রবেশ পথে এঁরা 'লড়ি' নামে এক ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করেন, যা স্বরের অত্যন্ত দ্রুত বিন্যাসের পাকোয়াজের বোল্-এর অনুকৃতি। পাখোয়াজের বোল্-এর অনুসরণে আরেক ধরনের লালঙ্করণ তার্-পরন্, যা মাইহার ঘরানার শিল্পীরা ব্যবহার করেন জোড় অংশে।

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এসব আত্মস্থ করেও সম্পূর্ণ নিজস্ব এক বাদন শৈলী সৃষ্টি করে গেলেন। শান্ত, সমাহিত, ভাবমগ্ন এই শিল্পী যখন ধীরে ধীরে সুরের গভীরে নিয়ে যেতেন, তখন শ্রোতার কাছে যে ভ্রমণ হত এত অনায়াস এবং নিরুদ্বিগ্ন যে, কখন যে তিনি আলাপ থেকে জোড়, জোড় থেকে জালা, জালা থেকে বিলম্বিত এবং ক্রমে দ্রুত গৎ -এ প্রবেশ করেছেন, তা বোঝা যেত না। সবটা নিয়েই ছিল তংার সহগীত —পূর্ণা অখণ্ড, এক!